



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 619 - 625

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলার রেশম শিল্প : বাণিজ্যিক ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সাম্রাজ্যবাদের একটি পর্যালোচনা

পল্লবী চ্যাটার্জী

সহকারী অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ

গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ তেহট

Email ID: ivy chatterjee675@gmail.com



Received Date 28. 09. 2025

Selection Date 15. 10. 2025

Keyword

Bengal silk industry,
Murshidabad,
Kasimbazar port,
East India
Company, Industrial
Revolution,
impact of famine
1770, colonial
economy,
Sericulture
department.

Abstract

The silk industry is one of the oldest and most significant cottage industries of India, with Bengal historically serving as a major hub of production and trade. References to silk fabrics in ancient Indian literature, including the Vedas, epics, and religious texts, attest to its antiquity and cultural value. In Bengal, the term “silk” is derived from ab-resham. The industry flourished along both banks of the Bhagirathi River, particularly in Murshidabad, Kasimbazar, Saidabad, Jangipur, and Rajshahi, from where raw silk was exported to markets across Europe and Asia.

The arrival of the Portuguese in the sixteenth century, followed by the Dutch, English, French, Armenians, and other European merchants, transformed Bengal's silk industry into a center of international commerce. Although the Dutch initially dominated, the English eventually took control, aided by local gumastars who participated in the trade. Murshidabad's rise as the capital of Bengal during the Nawabi period further enhanced the economic importance of the region.

However, the Battle of Plassey (1757) and subsequent colonial policies brought devastating consequences. The East India Company's duty-free trade privileges, along with the agency and contract system, disrupted traditional structures. The catastrophic famine of 1769–70, which decimated mulberry cultivators and weavers, inflicted irreparable damage. Coupled with declining European demand during the Industrial Revolution, the industry witnessed a steep decline.

In the nineteenth century, firms like Watson & Co., James Lyall & Co., and Louis Pajen & Co. attempted to revive trade, but foreign competition, silkworm disease, and administrative inefficiencies hindered progress. Reformers such as Nityagopal Mukherjee promoted sericulture through

pasteurization techniques, leading to the formation of the Bengal Silk Association in 1898. The early twentieth century saw renewed visibility through S. S. Bagchi & Co.'s participation in international exhibitions, but most European companies ultimately withdrew. The Textile Protection Act of 1934 and the establishment of a central silk research center at Berhampore were state-led interventions to safeguard the industry, but the disruption caused by the partition of Bengal ultimately marginalized its significance. Today, Bengal's once-thriving silk industry survives mainly in historical memory and material remnants.

Discussion

ভারতবর্ষ তথা বাংলার প্রাচীনতম কুটির শিল্পের মধ্যে রেশম শিল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। বাংলা ছাড়াও বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে রেশম চাষের প্রচলন ছিল, যার প্রমাণ ভারতের প্রাচীন সাহিত্যেই বিদ্যমান। চীনা পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে খ্রিষ্টপূর্ব ২৬০২ সালে সম্রাজ্ঞী সি-লু-চি-র আমলে রেশম আবিষ্কৃত হয় এবং দীর্ঘকাল চীনা রাজপরিবার এই গোপন কৌশল নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলেও একসময় তা এশিয়ার অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে। মধ্য এশিয়ার খোটান রাজার সঙ্গে এক চীনা রাজকন্যার বিবাহ সূত্রে রেশম কীটের ডিম ও তুঁতের বীজ প্রথম খোটানে প্রবেশ করে এবং পরবর্তীতে পারস্য হয়ে তা সমগ্র এশিয়ায় বিস্তার লাভ করে। যদিও ভারতবর্ষে রেশম চাষের সুনির্দিষ্ট সূচনাকাল নির্ধারণ করা কঠিন, তবে এর প্রচলন প্রায় দুই হাজার বছরের পুরনো। বেদ, রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে রেশম বস্ত্রের ব্যবহার উল্লেখ থাকায় এর ঐতিহাসিক প্রাচীনতা নিয়ে কোনো সংশয় নেই। প্রাচীন গ্রন্থে Kashuma, Dukula, Kaushaya, Pattabasha প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার ভারতীয় রেশম শিল্পের অস্তিত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। পানিনির ব্যাকরণে Kaushaya শব্দটি কোকুন বা কোষাকে নির্দেশ করে, Dukula শব্দের অর্থ দু'বার জন্ম, যা কীট থেকে প্রজাপতির জন্মরূপক, Kashuma শব্দ সুতাকে বোঝায় এবং Pattabasha অর্থ পাতার বসন, যা আসামের Pat রেশমের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। এসব শব্দ প্রমাণ করে যে ভারতীয়রা চীন থেকে রেশম প্রযুক্তি আসার অনেক আগেই রেশম ব্যবহার করত।

বাংলায় প্রচলিত রেশম শব্দটির উৎস পারসিক 'আব-রেশম'। প্রাচীন বাংলায় প্রচলিত একটি প্রবাদ— “পরে তসর খায় ঘি, তার পয়সার দরকার কি” — এই কথাটি থেকে বোঝা যায় যে তসর সিল্ক বাংলায় বিশেষ জনপ্রিয় ছিল এবং তসর বস্ত্র ছিল দামী ও আভিজাত্যের প্রতীক। তুঁত রেশম থেকে গরদ ও মটকা সিল্কের উৎপাদন সম্ভবত বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের উদ্যোগে শুরু হয়েছিল। যদিও মুসলিম শাসনকালেই এর ব্যবহার বহুল প্রচলিত হয়। ইতালীয় পর্যটক লুডোভিকো ভারথেমা ১৫০৩ খ্রিষ্টাব্দে উল্লেখ করেন যে ‘ভারতের বঙ্গদেশে প্রচুর সিল্ক উৎপন্ন হয়’। সেই সময় বাংলার মুখসুদাবাদ, মালদহ, রাজশাহী, জঙ্গীপুর, সৈদাবাদ, কাশিমবাজার, আজিমগঞ্জ, রামপুর বোয়ালিয়া, কান্দি, খড়গ্রাম, রামপুরহাট, বীরভূম ও বিষ্ণুপুরসহ বহু অঞ্চলে বিপুল পরিমাণ কাঁচা রেশম ও রেশমজাত দ্রব্য উৎপন্ন হত। মুখসুদি (মুর্শিদাবাদ) ও সিদাবন্দি (সৈদাবাদ) রেশমবস্ত্র ছিল বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। ভাগীরথীর দুই তীরজুড়ে কাশিমবাজার বন্দর গড়ে ওঠে, যেখান থেকে কাঁচা রেশম ও রেশমজাত দ্রব্য গুজরাট, আমেদাবাদ, লাহোর হয়ে সমগ্র এশিয়া ও ইউরোপে রপ্তানি হত। সস্তা দামে বিপুল চাহিদাসম্পন্ন হওয়ায় দেশি-বিদেশি বণিকরা এই সময় কাশিমবাজার বন্দরে ভিড় জমাতে থাকে।

ষোড়শ শতকে প্রথমে পর্তুগিজরা বাংলায় বাণিজ্য শুরু করে। তারা সপ্তগ্রাম, মালদহ, রাজমহল, বালাসোর ও কাশিমবাজার বন্দর থেকে রেশম সংগ্রহ করে গুজরাট ও উত্তর ভারতে রপ্তানি করত। যদিও তারা কোনো সংগঠিত প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারেনি। পরবর্তীকালে অষ্টাদশ শতকে তারা মূলত লেখক, মুন্সি ও সৈনিক হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।^১ ইংরেজরা ১৬৫৮ খ্রীঃ কাশিমবাজারে তাদের বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেছিল। তবে তার অনেক আগে ১৬২০ খ্রীঃ ইংরেজ দূত স্যার টমাস রো জাহাঙ্গীরের রাজসভায় বাংলার রেশম বস্ত্রের সম্ভার দেখে মুগ্ধ হয়ে ইংরেজ বাণিজ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে ইংরেজ এজেন্ট হিউজ এবং পার্কারকে আগ্রা থেকে নিম্ন গাঙ্গেয় অঞ্চলে বাংলায় পাঠিয়েছিলেন। তারা ৫০০ টাকার

মুখসুদাবন্দী ও সৈদাবন্দী রেশম বস্ত্র নমুনা হিসেবে সংগ্রহ করে দেশে ফিরে যায় যা ইংল্যান্ডে সমাদর লাভ করেছিল।ⁱⁱ এই বিপুল লাভের আশায় ইংরেজরা ১৬৫২ সাল নাগাদ বাংলায় বাণিজ্য করতে আসে। যদিও তখন বাংলায় প্রচুর কাঁচা রেশম উৎপন্ন হত তবে এই রেশম সুতা পারস্য, সিরিয়া, সাদ এবং বেইরুটের মত মসৃণ ছিল না, কিন্তু তা দামে খুবই সস্তা ছিল। রেশম সুতোর গুণগত মান উন্নত করার জন্য ১৬৮১-৯০ খ্রীঃ নাগাদ কাশিমবাজারে ইংল্যান্ড থেকে কয়েক জন সুদক্ষ কর্মচারীকে আনা হয়েছিল। এই সময় জব চার্নক রেশম কুঠির অধ্যক্ষ ছিলেন।ⁱⁱⁱ উন্নত যন্ত্রপাতি ইংল্যান্ড থেকে আনা হলে উৎপাদন বৃদ্ধি হল ঠিকই কিন্তু দাম অসম্ভব কমে গেল। কারণ ১৭০০ সাল নাগাদ ভারতীয় সিল্ক বস্ত্রের ওপর ইংল্যান্ডে নিষেধাজ্ঞা জারী হয়। ভারতীয় রেশম বস্ত্রশিল্পের উপর নতুন কর ধার্য করা হয়। এই প্রথম ভারতীয় সিল্কবস্ত্র বিশ্ববাজারে ধাক্কা খায়। ডাচরা যদিও ইংরেজদের অনেক আগে, ১৬২৫ সালে কাশিমবাজার ও কাগ্রামে রেশম কারখানা স্থাপন করেছিল। ১৬৭৬ খ্রীঃ লিখিত টার্ডেনিয়ারের ভারত বিবরণ থেকে জানা যায় ডাচরা রেশম-জাত দ্রব্যের উৎপাদন প্রায় ১০ গুণ বৃদ্ধি করেছিল। তাদের কাশিমবাজারের কারখানায় প্রতিদিন ৮০০ লোক কাজ করত। এরা ইংরেজদের চাইতে অনেক বেশী রেশম (১৬৪৯ সালে প্রায় ৭০ হাজার, ১৬৫৪-তে ২ লক্ষ, ১৬৬৩-তে ২২ লক্ষ পাউন্ড কাঁচা রেশম) রপ্তানী করত এবং ১৭৩০ খ্রীঃ পর্যন্ত এই ব্যবসা তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। কাশিমবাজারের কালিকাপুর অঞ্চলে তাদের সমাধি স্তম্ভ আজও বিদ্যমান।^{iv}

আর্মেনিয়ানরা ১৬৬৫ সাল নাগাদ বাংলায় আসে। তারা সম্রাট ঔরঙ্গজেবের কাছ থেকে সৈদাবাদ অঞ্চলে বসতি স্থাপনের ফরমান পায়। সেখানে তারা একটি গির্জাও নির্মাণ করেছিলেন। আরমেনিয়ান চার্চ সংলগ্ন এই অঞ্চলটি আজও সৈদাবাদ গির্জাপাড়া নামে পরিচিত। আর্মেনীয় বণিকরা প্রতি বছর কাশিমবাজার থেকে ১০০ মণ কাঁচা রেশম সুরাট এবং ১০০০ মণ কাঁচা রেশম মির্জাপুর, নাগপুর, ছত্তরপুর, বেনারস ও অন্যান্য অঞ্চলে পাঠাত। এরা রাষ্ট্রশক্তি নিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করতে নামেনি বলেই নানা জায়গায় ব্যবসা চালিয়ে যেতে পেরেছিল। ফরাসীরা অপেক্ষাকৃত অনেক দেরিতে বাংলায় আসে এবং ১৬৯১ সালের আগে এখানে তাদের কোনো রেশম কারখানা ছিল না।^v তারা সৈদাবাদে আরমেনীয়দের সঙ্গে যৌথভাবে কুঠি নির্মাণ করে এবং মালদহেও একটি কারখানা স্থাপন করে। ১৭৫৮-১৭৬৪ সময়কালে ফরাসীরা কর্ণটিকের সিংহাসনকে কেন্দ্র করে ইংরেজদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পরে এবং শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। ফরাসীরা তখন ইংরেজদের দয়ার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ১৭৭০ সালে কোম্পানী কার্যত বাংলা থেকে অবলুপ্ত হয় এবং ইংরেজরা ফরাসী বাণিজ্যের উপর একচ্ছত্র অধিকার লাভ করে। সর্বশেষ ইউরোপীয়ান ব্যবসায়িক প্রতিযোগী ছিল অস্টেন্ড কোম্পানি, যারা এসেছিল ১৭২৩ সালে। তাদেরও একটি রেশম কুঠি সৈদাবাদে ছিল। তবে ফরাসী, ডাচ, ইংরেজ বণিকদের মিলিত জোটের কাছে তারা বাণিজ্য চালিয়ে তেমন সুবিধা করতে পারেনি। অন্যদিকে দেশীয় বণিকদের মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে ছিল গুজরাটী বণিকরা। এদের মধ্যে নীলমনি দাস, গোবিন্দ দাস, গোলাপ চাঁদের নাম উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ছিল শেঠ, বসাক ও কাঠমা পরিবার। ১৭৬৫ সাল নাগাদ এই সকল বণিকরা প্রতিবছর মির্জাপুর ও বেনারসে ২০০-৩০০ মণ রেশম থান রপ্তানী করত। কাশিমবাজার সিল্ক থেকেই নাগপুর, ছত্তরপুর, পুনা ও বেনারসে, কিংখাপ, গুলবাহার বা ব্রোকেট তৈরী করা হত। তৎকালীন বাঙালী বণিকদের মধ্যে কান্ত শর্মা, কৃষ্ণকান্ত নন্দী ও বৈষ্ণবচরণ নন্দী (কাশিমবাজার রাজ পরিবার), প্রাণকৃষ্ণ সিংহ (কান্দী রাজ পরিবার),^{vi} শিবনাথ আচার্য, কালীচরণ বাগচী, গোপীচরণ সরকার উল্লেখযোগ্য। এই সময়ের ৯৯ জন রেশম বণিকের তালিকা কাশিমবাজার রাজ রেকর্ডে উল্লেখ আছে। তাদের মধ্যে ৯৮ জনই হিন্দু। এক জন মুসলমান বণিকের নাম ছিল নবাব মহম্মদ।

W.W. Hunter তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে 'মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে অন্যান্য ফসলের চাইতে রেশম চাষই বেশী লাভ জনক। রেশম সুতোর গুণগত মান ঠিক রাখতে অবশ্যই সতেজ তুঁত পাতা দরকার।'^{vii} সে সময় বছরে তিনবার—মার্চ, জুলাই এবং নভেম্বর মাসে পলুর চাষ হত। তবে নভেম্বর মাসের বন্দের পলুই ছিল সর্বোত্তম মানের। একটি আদর্শ পলু পালনের ঘর সাধারণত ২০ ফুট লম্বা, ১৫ ফুট চওড়া ও ৯ ফুট উঁচু হত, যার দেওয়াল মাটির এবং চাল খড়ের। ঘরে বাতাস চলাচলের জন্য উপরের দিকে ছোট জানালা থাকত। বাংলার কাঁচা রেশম হলুদ রঙের ছিল, যা কলাগাছ পোড়ানো ছাইয়ের সাহায্যে স্বেদ করে সুতো হিসেবে ব্যবহারযোগ্য করা হত।^{viii} মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে কোকুন সাধারণত সংখ্যায় ক্রয়-

বিক্রয় হত, অথচ রাজশাহীতে ওজনে।^{ix} সুতো তৈরির কাজে মুর্শিদাবাদে নারীরা নিযুক্ত থাকলেও রাজশাহীতে তা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। একজন বালক বা বালিকার মাসিক মজুরি ছিল ৩ টাকা, আর উইন্ডারদের মজুরি ছিল ৫ টাকা। মুর্শিদাবাদ ও কাশিমবাজারে উৎপন্ন হতো সাদা থান, কারুকাজযুক্ত বা কারুকাজবিহীন ট্যাফেটা, হ্যান্ডকার্চিফ, স্টকিংস, গ্লাভস, ব্যান্ডানা, মটকা, গরদ ইত্যাদি নানা রকম রেশমজাত পণ্য। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল জিয়াগঞ্জ সংলগ্ন বালুচর অঞ্চলের বালুচরী শাড়ি, যার আঁচল ও পাড়ে পৌরাণিক কাহিনির চিত্রাঙ্কন করা হত। একটি শাড়ি তৈরিতে প্রায় ছয় মাস সময় লাগত, যা ছিল শিল্পকর্মের এক বিস্ময়কর নিদর্শন। সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তত ১৩৭টি গ্রামে তাঁতশিল্প চালু ছিল, যেমন বসোয়া, বিষ্ণুপুর, মাড়গ্রাম, মির্জাপুর, রামপুরহাট, জঙ্গীপুর, মালদা, বোয়ালিয়া, কুমারখালি ও রুদ্রনগর। রাঙ্গামাটি চাঁদপাড়া বাজার ছিল অঞ্চলের প্রাচীনতম সিল্ক বাজার।^x কৃষকরা অন্যান্য ফসলের পাশাপাশি তুঁত চাষ করত এবং পরিবারের সকলে মিলে রেশম পোকার পরিচর্যা করত। এই কারণেই স্থানীয় প্রবাদ জন্মেছিল— “যা না করে পুতে, তাই করে তুঁতে”, অর্থাৎ তুঁতের ফলন সন্তান থেকেও অধিক সমৃদ্ধি আনে। ১৭৩৯ সালের মধ্যে কাশিমবাজার বন্দরে প্রতি বছর ৫০-৬০টি জাহাজ নিয়মিত আসত। সে সময় এক সের কাঁচা রেশমের দাম ছিল ৩ থেকে ৭ টাকা। ইংরেজ কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে ধোপারা সর্বোচ্চ মজুরি পেত, কারণ তাদের কাজ ছিল কাপড়ের গুণগত মান যাচাই করা।

মুর্শিদাবাদের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক গুরুত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি পায় ১৭০৪ সালে, যখন মুর্শিদকুলি খাঁ বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে সরিয়ে মুখসুদাবাদে আনেন এবং নামকরণ করেন মুর্শিদাবাদ।^{xi} তিনি বাংলাকে ১৩টি চাকলায় বিভক্ত করেন, যার মধ্যে মুর্শিদাবাদ চাকলা ছিল আয়তনে সবচেয়ে বড়। এই সময়কার অর্থনৈতিক ক্ষমতার অন্যতম নিয়ন্ত্রক ছিল জগৎ শেঠ পরিবার, যাদের অনুমতি ছাড়া কোনো সোনা বা রূপা গলানো যেত না। সমস্ত দেশীয় ও ইউরোপীয় বণিকরা তাদের ব্যাংকিং পরিষেবার ওপর নির্ভর করত। জগৎ শেঠ মানিকচাঁদ ও ফতেচাঁদ ছিলেন বিশেষ খ্যাতিমান, যাদের ধনসম্পদের তুলনা সমকালীন ইউরোপেও পাওয়া যায় না। তবে এই সময় রাজনৈতিক পালাবদলের কেন্দ্রবিন্দুতেও পরিণত হয় মুর্শিদাবাদ। ১৭৫৭ সালে ইংরেজরা, দেশীয় রাজ-রাজা ও অভিজাত শ্রেণীর মিলিত জোটের সাহায্যে নবাব সিরাজদৌল্লাকে পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত করে মীরজাফরকে বাংলার মসনদে বসায়। দেশীয়ব্যবসায়ীদের হটিয়ে তারা বিনা শুক্কে বাণিজ্য চালাতে শুরু করে, যার ফলস্বরূপ নবাব মিরকাশিম এর সঙ্গে ইংরেজদের সংঘাত শুরু হল।^{xii} বক্সারের যুদ্ধে মিরকাশিমকে পুরোপুরি পরাজিত করে বাংলার সম্পূর্ণ ক্ষমতা ইংরেজদের হাতে আসে। ১৭৬৫ সালে দিল্লির সম্রাট বাংলার দেওয়ানী ইংরেজদের প্রদান করলে তারা বাংলা থেকে সংগৃহীত রাজস্ব ব্যবসা করে লাভের অংশ ইংল্যান্ডে পাঠাতে শুরু করে। এরপর আজিমগঞ্জ ও জঙ্গীপুর অঞ্চলে ইংরেজরা বৃহৎ সিল্ক কারখানা স্থাপন করে।^{xiii}

প্রথম দিকে ভাষাগত সমস্যার জন্য ইংরেজ বণিকরা দেশীয় লোকেদের গোমস্তা, পাইকার, দালাল হিসেবে নিযুক্ত করত। ব্যবসার জন্য চাষীকে অগ্রিম অর্থ দানন হিসেবে দেওয়া হত ফলে বাজার দর বেশী থাকলেও চাষী পাইকারি ব্যবসাদারকে অল্প মূল্যে রেশম বিক্রি করতে বাধ্য থাকত। দালাল বা পাইকারি ব্যবসাদাররা এই রেশম ইংরেজ আড়ৎ এ জমা দিত। এতে ব্যবসার উন্নতি না হওয়ায় ইংরেজরা শুরু করল এজেন্সি প্রথা। এজেন্সি প্রথাও ফলপ্রসূ না হওয়ায় কাশিমবাজারে শুরু হয় কনট্রাক্ট সিস্টেম। এই প্রথা অনুসারে স্থানীয় বণিকদের উন্নত মানের রেশম সংগ্রহের জন্য অগ্রিম অর্থ দেওয়া হত। গভর্নর জেনারেল ভেরেলেষ্ট এই সময় জমিদারদের তুঁত চাষ বৃদ্ধি করার জন্য অনুরোধও জানিয়েছিলেন। চাষীদের তুঁত জমির খাজনা দুই বছরের জন্য মুকুব এবং তৃতীয় বছরের জন্য অর্ধেক করাও হয়েছিল। কিন্তু ঠিক ১৭৬৯-৭০ সালে বাংলায় ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এই অবস্থাতেও জোর করে চাষীদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতে থাকে। বেশীর ভাগ তুঁত চাষী মারা পড়ে এবং কেউ কেউ অন্য রাজ্যে পালিয়ে যায়। ফলে দুর্ভিক্ষ শেষে কোম্পানীর পক্ষে রেশম সংগ্রহ অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে পড়ে।^{xiv} বিশেষত বিপুল সংখ্যক বস্ত্রশিল্পীর মৃত্যু বংশানুক্রমিক শিল্প দক্ষতার অবলুপ্তি ডেকে আনায় রেশমবস্ত্র শিল্পের যে ক্ষতি হয়েছিল তা কার্যত অপূরণীয় হয়ে ওঠে। উন্নত রেশম উৎপাদনের জন্য ১৭৭০ সালে জেমস্ রবিনসন ওয়াইস, ইউলিয়াং, এবং আওবাটি নামে তিনজন দক্ষরেশম শিল্পীকে ইংল্যান্ড থেকে আনা হয় এবং তাদের কাশিমবাজারের রেশম কুঠিতে নিযুক্ত করা হয়। ওয়াইসএর পরামর্শ অনুসারে রোদে কোকুন শুকানোর পরিবর্তে স্টীমের সাহায্যে কোকুন সিদ্ধ করার প্রথা চালু হয়। তিনি রিলিং করার সময় সুতো কেটে

গেলে তা জোড়া দিতেও নিষেধ করেছিলেন। এই ভাবে সুতোর গুণগত মান কিছুটা হলেও বৃদ্ধি হয়েছিল। কাঁচা রেশমের মান উন্নত করার জন্য ১৭৭০-৭১ সালে চীন থেকে রেশম পোকার ডিম আমদানী করে জঙ্গীপুর অঞ্চলে পালন করা হয়েছিল, কিন্তু চাষীদের অযত্ন ও ভুল ব্যবস্থাপনার জন্য সেই উদ্যোগ ফলপ্রসূ হয়নি। যদিও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বারবার উন্নত পলুর চাষের জন্য চাষীদের প্রশিক্ষণ দিত, তবে তা গ্রহণ না করে চাষীরা তাদের প্রথাগত নিজস্ব ভারতীয় চাষের ধারাই বজায় রাখত। বিশেষ করে হিন্দু চাষীরা পদ্ধতি পরিবর্তনে অনাগ্রহী ছিল।

১৭৭০ - ১৭৮০-র দশকে ইংরেজ কোম্পানী ভারতবর্ষে হায়দর আলি, টিপু সুলতান ও মারাঠাদের সাথে যুদ্ধ ও অন্য দিকে ইউরোপের ঘরোয়া যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এবং বাংলার রাজস্ব সেই যুদ্ধে ব্যয় হতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে বেঙ্গল কাউন্সিল বাংলা থেকে ইংল্যান্ডে রেশম রপ্তানী বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়। ভারতীয় রেশমবস্ত্র আরও ধাক্কা খায় কারণ এই ১৭৭০-৮১ সাল নাগাদ ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব ঘটে। ইংল্যান্ডের কারখানায় কমদামে সস্তা ও টিকসই বস্ত্র তৈরী হতে থাকে। ইউরোপের বাজারে ভারতীয় বস্ত্রের চাহিদা একেবারেই কমে যায়। ১৭৮৩ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ ইংরেজ কোম্পানি এক নতুন ব্যবস্থা শুরু করে। তারা কাঁচা রেশম থেকে মসলিন তৈরী করে তা আবার ভারতেই বিক্রির জন্য পাঠাতে শুরু করে। কাশিমবাজারের মসলিনের চাইতে ২০ টাকা কম দামে বিলিতি মসলিন ভারতে বিক্রি হতে থাকে, ফলে কাশিমবাজার ডাচ কুঠিতে রেশম ব্যবসা বন্ধই হয়ে যায়। রেশম ব্যবসাকে কেন্দ্র করে ডাচদের সাথে ইংরেজদের সংঘর্ষ বাধে। গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস ডাচ কুঠিগুলো দখল করে নেয়। ডাচরা অনান্য রেশম কুঠিগুলো বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়। এভাবে ডাচদের রেশমব্যবসা সম্পূর্ণ ভাবে ইংরেজদের হাতে চলে যায়। যেহেতু বাংলা ছিল ইংরেজদের অধীন, তাই ইংরেজ কোম্পানী জোড় করে রেশম বস্ত্র উৎপাদনের পরিবর্তে Raw Silk উৎপাদন করার জন্য চাষীদের ওপর অত্যাচার করতে শুরু করে। এর একটা অন্য কারণ অবশ্য ছিল। ভারতীয় রেশম ইংল্যান্ডের কারখানায় ব্যবহারের উপযোগী ছিল না। ইংল্যান্ডের কারখানার ব্যবহারযোগ্য রেশম সুতা উৎপন্ন করার জন্য ইউরোপ থেকে বিশেষজ্ঞ আনা হলেও তা কার্যকর হয়নি। ১৭৮৩ খ্রীঃ রেশম ব্যবসাকে ব্যক্তিগত মালিকানায় দেওয়া হয়েছিল এবং ১৮২৫ সাল পর্যন্ত এই ব্যবস্থাই বলবৎ ছিল। ১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দে কোম্পানি তার কাশিমবাজার কুঠিটি Dr. Mephersem নামে একজন ব্যবসায়ীকে বিক্রি করে দেয়।^{xv} তিনি বেশ কয়েক বছর এই ব্যবসা চালু রেখে ছিলেন। তিনি বানজেটিয়াতে একটি সুন্দর অট্টালিকা নির্মাণ করে বাস করতেন। এই সম্পত্তি তিনি James Lyall নামে একজন ইংরেজ ব্যবসায়ীকে পরবর্তীকালে বিক্রি করেছিলেন। এই ব্যক্তিই ১৮৮০ সালে বেঙ্গল সিল্ক কোম্পানী গঠন করেন। তিনি কাশিমবাজারের পরিবর্তে বহরমপুর, বাবুলবোনা, গোনাটিয়া ও বড়োঞাতে রেশম কুঠি স্থাপন করেছিলেন। বাবুলবোনায় ১৩টি Filature ছিল সেখানে ২০৩৯ জন Spinners কাজ করত। এই সময় বড়োঞা থানায় মোট ১১০টি Filature ছিল। যদিও এই নতুন মালিক বেশিদিন ব্যবসা চালাতে পারেন নি। কিছুকাল পরে তিনি কাশিমবাজার কুঠি বিক্রি করে দেন এবং এর ইট ও কাঠ দিয়ে পরবর্তিকালে তৈরী হয় বহরমপুর জেলা শাসকের বাংলো। অন্যদিকে তাঁর কাছ থেকে বানজেটিয়ার অট্টালিকা কিনে নেয় কাশিমবাজার রাজা যা বর্তমানে বানজেটিয়া কলেজ নামে পরিচিত। এই ভাবে কাশিমবাজারের রেশমব্যবসা তার পুরানো গৌরব হারাতে থাকে।

উনিশ শতকে M/s Watson & Co., James Lyall & Co., Louis Pajen & Co., ইত্যাদি নামে উল্লেখযোগ্য বেশ কয়েকটি সিল্ক কোম্পানি ছিল। শুধুমাত্র Louis Pajen & Company তেই মুর্শিদাবাদের ১২টি গ্রামে মোট ৩১,৭৬৮টি Spinners Turners কাজ করত। এই ফার্মগুলো বাজারপাড়া, নারায়ণপুর অঞ্চলে তসর সিল্কও তৈরী করত। ১৮৯২ সালে ফরাসী গভর্নর সিল্ক রপ্তানীর উপর অতিরিক্ত কর ধার্য করার ফলে ভারতীয় সিল্ক এর দাম বেশী হওয়ায় জাপান, চীন ও ইটালীর সস্তা সিল্ক ইউরোপের বাজার দখল করে নেয়। বিদেশী রেশমের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বাংলার রেশম পিছিয়ে পড়ার একটি প্রধান কারণ ছিল রেশম পোকার রোগ। ব্রিটিশ ভারতের গভর্নমেন্ট এ বিষয়ে ১৮৮২ সাল পর্যন্ত কোন পদক্ষেপই নেয়নি। ১৮৮৬ সালে ইংল্যান্ডের ভারতীয় কতৃপক্ষ তুঁতচাষ বৃদ্ধি ও চাষীদের উন্নত রোগমুক্ত ডিম সরবরাহের কথা চিন্তা করে। স্যার টমাস ওয়াভেল কলকাতায় আসেন এবং একটি সম্মেলনের আয়োজন করেন। এই সম্মেলনে তুঁতচাষের অবনতির কারণ অনুসন্ধানের জন্য উড ম্যানসন ও শ্রী নিত্য গোপাল মুখার্জীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই উদ্দেশ্যে শ্রীনিত্য গোপাল মুখার্জীকে ইউরোপেও পাঠানো হয়। তিনি ফ্রান্স, ইটালী প্রভৃতি দেশে রেশম চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেন

এবং পাস্তুরাইজেশন পদ্ধতিতে রোগমুক্ত ডিম উৎপাদন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে দেশে ফিরে আসেন। তিনি দেশে ফিরে বহরমপুর শহরে ছোট ছোট নার্সারী তৈরী করে সেখানে পরীক্ষামূলক ভাবে কাজ করতে শুরু করেন ও চাষীদের প্রশিক্ষণ দিতে থাকেন। ১৮৯৭ সালে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে নিত্যগোপাল মুখার্জীর উদ্যোগে আসামের ১৫০ জন দরিদ্র মটকা শিল্পীকে বহরমপুরে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল।^{xvi} তসর রেশম চাষ এর উন্নতির জন্য ১৮৯২ সালে কেন্দ্রীয় বনদপ্তর মেদিনীপুর, চাইবাসা, কোন্ডা, বিলাসপুর, সম্বলপুর, বালান্ধাট, ভান্ডারা প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবাসীদের তসর পলু পলুপালনের ও সংগ্রহের উপর থেকে কর সম্পূর্ণ মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

পরবর্তীকালে ১৮৯৮ সালে বেঙ্গল সিল্ক অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি কমিটি তৈরী হয়। এই কমিটির সদস্যগণ প্রতি মাসে বহরমপুরে একটি সাধারণ সভার আয়োজন করত এবং সেখানে পলুর রোগ ও পাস্তুরপ্রণালীর ব্যবহার বিষয়ে আলোচনা হত। ১৮৯৯ সালে সিল্ক বণিকরা এই দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলে নেয়। ১৮৯৯-১৯০৭ সাল পর্যন্ত তারা মুর্শিদাবাদের রেশম শিল্পের উন্নতির জন্য অনুদান মঞ্জুর করে। বাবু সুধাংশু শেখর বাগচী বহরমপুরের একজন খ্যাতনামা রেশম ব্যবসায়ী ছিলেন। মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দীর পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি রেশম শিল্পের উন্নতির জন্য ১৯০৫ থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত প্যারিস, লন্ডন ও ভারতবর্ষের জাতীয় মহা সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত মেলায় রেশমজাত দ্রব্যের প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। তাঁর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল S. S. Bagchi & Co. তার পুত্র শৈলেন্দ্র শেখর বাগচীকে রেশম শিল্পবিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য জাপানেও পাঠানো হয়েছিল।

শ্রীনিত্য গোপাল মুখার্জী যদিও ১৯০৩ সালে ২০ লক্ষ টন সিল্ক সুতা উৎপন্ন হয়েছে বলে দেখিয়েছিলেন কিছু সেনসাস রিপোর্টে তা মানা হয়নি কারণ, ১৯০৮-১৯০৯ সালের মধ্যে সমস্ত ইউরোপীয় কোম্পানীগুলি তাদের ব্যবসা গুটিয়ে নিয়েছিল এবং বেঙ্গল সিল্ক কোম্পানী তখন প্রায় অবলুপ্ত। ১৯০৮ সালে সরকারী অনুদানও বন্ধ হয়ে যায়। সেই বছরই Agriculture দপ্তরের উদ্যোগে সেরিকালচার নামে আলাদা একটি বিভাগ গঠন করা হয় এবং এই বিভাগের প্রধানের পদনাম হয় Superintendent of Sericulture. ১৯১১ সালে বহরমপুরের ছোট ছোট নার্সারী গুলো তুলে দিয়ে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে বড় আকারে তুঁতচাষ বৃদ্ধি ও উন্নত পলুর ডিম সরবরাহের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই উদ্দেশ্যে বহরমপুরে ৬২ বিঘা জমি নিয়ে একটি কেন্দ্রীয় নার্সারী তৈরী হয়। যার প্রধান দায়িত্বে ছিলেন Assistant Superintendent। অন্যান্য কেন্দ্রীয় নার্সারীগুলি ছিল চন্দনপুর, কুমারপুর, মহম্মদপুর প্রভৃতি স্থানে। ১৯১২ সালে উন্নত হাইব্রিড পলু তৈরীর জন্য Mr. F. D. Lafont নামে একজন ইউরোপীয়ান অধ্যাপককে সেরিকালচার রিসার্চ এ Superintendent নিযুক্ত করা হয়েছিল। তিনি এক বছর ইউরোপীয় ও ভারতীয় প্রজাতির মিশ্রণে উন্নত রেশম কীট তৈরীর কাজে যুক্ত ছিলেন।^{xvii} তারপর এই কাজ অন্যরা চালিয়ে যেতে থাকে।

এই ভাবে দেখা যায় রেশম শিল্পের ধংসের কারণ অনুসন্ধানের জন্য কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় স্তরে উদ্যোগ নেওয়া হলে ১৯৩৪ সালে Textile Protection Act নামে একটি সংগঠন তৈরী হয়। রেশম শিল্পকে অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করার উদ্যোগ স্বরূপ তৎকালীন Union Govt. বহরমপুরে একটি কেন্দ্রীয় সেরিকালচার রিসার্চ স্টেশন চালু করে, যার প্রধান দায়িত্বে ছিলেন একজন Deputy Director। এই প্রতিষ্ঠানে একজন ব্যায়েলজিস্ট, একজন প্যাথলজিস্ট, একজন বোটানিস্ট ও একজন ব্যায়োকেমিস্ট নিযুক্ত করার পাশাপাশি Assistant Officer ও Field workers নিযুক্ত করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি সর্বভারতীয় রেশম উৎপাদন কেন্দ্রগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করত।

তবে দেশভাগের পর মুর্শিদাবাদের কাঁচা রেশম সরবরাহ কমে যায়। ভারত সরকার প্রশিক্ষণ ও অনুদানের ব্যবস্থা করলেও মুর্শিদাবাদের উৎপাদিত কাঁচা রেশম মূলত গুজরাট ও উত্তর ভারতের শিল্পে ব্যবহৃত হতে থাকে। বিদেশি বাজারে প্রতিযোগিতা ও দেশীয় শিল্পের অব্যবস্থাপনার কারণে ধীরে ধীরে বাংলার রেশম শিল্প হারায় তার গৌরবময় অবস্থান। এককালে যে শিল্প সম্ভার বিদেশিদের বাংলায় টেনে এনেছিল, আজ তা কেবল ইতিহাসের দলিল ও ধ্বংসস্তুপের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায়, যা নিঃসন্দেহে বেদনাদায়ক এক বাস্তবতা।

Reference:

- i. K. M. Mohsin, *A Bengal District in Transition: Murshidabad 1765–1793* (Dacca: The Asiatic Society of Bangladesh, 1973), p. 7
- ii. K. M. Mohsin, *A Bengal District in Transition: Murshidabad 1765–1793* (Dacca: The Asiatic Society of Bangladesh, 1973), p. 47-48
- iii. L. S. S. O'Malley, *Bengal District Gazetteers: Murshidabad* (Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot, 1914), p. 126
- iv. L. S. S. O'Malley, *Bengal District Gazetteers: Murshidabad* (Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot, 1914), p. 126
- v. Abdul Karim, *Murshid Quli Khan and His Times*, Asiatic Society of Pakistan, Bangladesh, 1963, P.200
- vi. Somendra Chandra Nandy, *Life and Times of Cantoobaboo, the Banian of Warren Hastings, 1742–1804*, Vol. 1 (Calcutta: Allied Publishers, 1978), p. 393–395
- vii. W. W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal*, vol. 9 (London: Trübner & Co., 1876), p. 148
- viii. K. M. Mohsin, *A Bengal District in Transition: Murshidabad 1765–1793* (Dacca: The Asiatic Society of Bangladesh, 1973), p. 4
- ix. W. W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal*, vol. 9 (London: Trübner & Co. p. 149
- x. *Census 1951, West Bengal District Hand Books: Murshidabad*, edited by A. Mitra (Calcutta: Govt. of West Bengal, 1951), p. XXVIII
- xi. Charles Stewart. *The History of Bengal*. (London: Black, Parry and Co., 1813), p. 358
- xii. Sinha, Surendra Nath. *Mir Qasim*. Calcutta: Firma K. L. Mukhopadhyay, 1962, P. 172
- xiii. W. W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal*, vol. 9 (London: Trübner & Co., 1876), P. 82
- xiv. K. M. Mohsin, *A Bengal District in Transition: Murshidabad 1765–1793* (Dacca: The Asiatic Society of Bangladesh, 1973), PP. 72-73
- xv. L. S. S. O'Malley, *Bengal District Gazetteers: Murshidabad* (Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot, 1914), P. 127
- xvi. Ibid., P. 134
- xvii. Ibid, P. 129